দ্বাদশ অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন

[টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হলো মানবসম্পদ। এ কারণে একটি দেশের অর্থনীতিতে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) মানব কল্যাণ এবং দারিদ্র বিমোচনকে বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থ সামাজিক খাতে শতকরা ২০ ভাগের অধিক হারে অর্থ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬৪.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলংকার পরেই বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে এক বিরল অর্জন। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক,সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। এছাড়া, শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতিমালা ২০১১।]

দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও অপরিহার্য। এ কারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জাতীয় উন্নয়নের অন্য উপাদানগুলো, এমনকি সুশাসনও শেষ পর্যন্ত উন্নত মানবসম্পদের ওপর নির্ভর করে। উন্নয়নের স্তর নির্বিশেষে যে কোন দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদে অভিন্নমাত্রার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার অর্জন নিশ্চিত হলে জনগণ দীর্ঘ ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশে জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ

দরিদ্র জনগাষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সামাজিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ। কারণ, সামাজিক খাত উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে অধিকতর মূল্য সংযোজনে যথেষ্ট অবদান রাখে। বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের শতকরা ২০ ভাগের অধিকহারে অর্থ সামাজিক খাতে ব্যয় করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সূচকের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জন এবং প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, যক্ষ্মা ও AIDS বিস্তার রোধ, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে।

লেখচিত্র ১২.১: কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে মোট বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

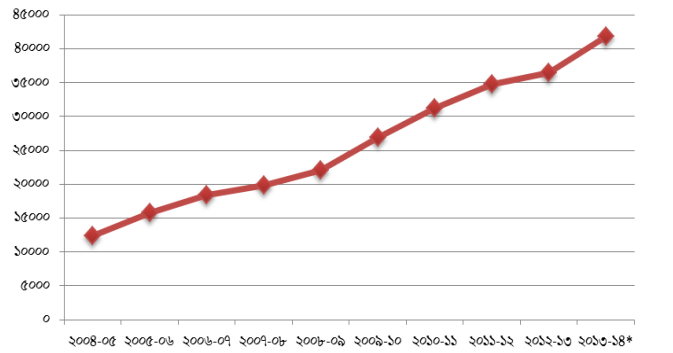

*তথ্যসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক

২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক খাতে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন বাজেট-এর সমন্বিত বরাদ্দ ও বরাদ্দের গতিধারা যথাক্রমে নিম্নের লেখচিত্র ১২.১ ও সারণি ১২.১ এ দেখানো হলো। লক্ষ্যণীয় যে, এ খাতে গত এক দশকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে।

সারণি ১২.১: কতিপয় মন্ত্রণালয়ের সামাজিক খাতে বাজেট বরাদ্দের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) বিবরণ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ *
শিক্ষা এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৭৩৮১	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২১৫৬১	২৬০৯৩
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৩১৭৫	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯১৩০	৯৪৭০
যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২৯৭	৪১৪	৩৩৫	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৯৭৬	৯৪৪
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৯০	১০৬	৯৬	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	১৩৪	১৮৭
সমাজ কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	১১৫২	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৯১	৪৪২৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	৩০০	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৫৮৩	৭৫৫
মোট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)	**১২৩৯৫**	**১৫৭২৫**	**১৮৩২৯**	**১৯৮১৮**	**২২১২০**	**২৬৮৮০**	**৩১২১৮**	**৩৪৭১৮**	**৩৬৪৭৫**	**৪১৮৭৬**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। *তথ্যসমূহ মূল বাজেট ভিত্তিক।

সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ গড়তে মানবসম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। অপরদিকে দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই নারী, শিশু ও যুবক। তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাসমূহকে সরাসরিভাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। এ জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহের (শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান) ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

শিক্ষা দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি এবং সঠিক শিক্ষা কাঠামো দেশের উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমূখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা

২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৩-১৪) প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ১১,৮৫৩.০৯ কোটি টাকা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানব উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০৬,৮৫৮টি (ব্র্যাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদ্রাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৯ : ৫০.১-এ উন্নীত হয়েছে। ২০০০ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার নিম্নের সারণিতে দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.২: প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (২০০০-২০১৩)

(লক্ষে)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩ (৫১.১)	৮৬.৬৯ (৪৮.৯)
২০০১	১৭৬.৫৯	৮৯.৯০ (৫১.০)	৮৬.৬৯ (৪৮.০)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২ (৫০.৩)	৮৭.২০ (৪৯.৭)
২০০৩	১৮৪.৩১	৯৩.৫৯ (৫০.৮)	৯০.৭২ (৪৯.২)
২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭ (৫০.৪)	৮৯.০৬ (৪৯.৬)
২০০৫	১৬২.২৫	৮০.৯১ (৪৯.৮৭)	৮১.৩৪ (৫০.১৩)
২০০৬	১৬৩.৮৬	৮১.২৯ (৪৯.৬২)	৮২.৫৬ (৫০.৩৮)
২০০৭	১৬৩.১৩	৮০.৩৫ (৪৯.২৬)	৮২.৭৮ (৫০.৭৪)
২০০৮	১৬৭.৪৯	৮৩.২৫ (৪৯.৭০)	৮৪.২৪ (৫০.৩০)
২০০৯	১৬৫.৩৯	৮২.৪১ (৪৯.৮৩)	৮২.৯৮ (৫০.১৭)
২০১০	১৬৯.৫৮	৮৩.৯৫ (৪৯.৫০)	৮৫.৬৩ (৫০.৫০)
২০১১	১৮৪.৩২	৯১.৩৯ (৪৯.৬০)	৯২.৯৩ (৫০.৪০)
২০১২	১৯০.০৩	৯৪.৬৩ (৪৯.৮০)	৯৫.৪০ (৫০.২০)
২০১৩	১৯৫.৮৫	৯৭.৮১ (৪৯.৯৪)	৯৮.০৪ (৫০.০৬)

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘন্টা (contact hour) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০:৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৪.২:৩৫.৮;
- প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;

- দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের ৩৩ লক্ষ নব্যসাক্ষরের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নব্য-সাক্ষরদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের আয় সৃজনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ছয়টি বিভাগীয় শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১.৬৬ লক্ষ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানসহ জীবনভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে;
- প্রতিবছর সারাদেশে পঞ্চম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে;
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "ইংলিশ ইন এ্যকশান" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, চর, হাওর-বাওর এলাকায় শিখনকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৬টি উপজেলার ২৮ লক্ষ শিশুদের মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৭৪টি উপজেলায় প্রায় ২৭ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে এ কার্যক্রম চলছে;
- দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীদের মধ্যে সাক্ষরতার আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ জেলা) প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লক্ষ সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে;
- দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ উন্নয়নে অবকাঠামোর ভূমিকা ব্যাপক। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ৪৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে, ২৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৬৪০টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ৫,৯৬৯টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১,২০৮টি বিদ্যালয় মেরামত সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৪৫টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, ৬,৭৪০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ৮৬৯টি বিদ্যালয় মেরামত কাজ চলমান আছে। এ ছাড়াও ৫,৫৬৪টি গভীর/তারা নলকূপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, ৩,২১৭টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পিটিআই বিহীন নির্বাচিত ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে।

সমাপনী পরীক্ষা ও বৃত্তি প্রদান

বর্তমানে সারাদেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৩ সালের পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫.১৯ লক্ষ এবং

পাশের হার ৯৮.৫৮ শতাংশ। এবতেদায়ী মাদ্রাসা হতে সমাপনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২.৭৪ লক্ষ এবং পাশের হার ৯৫.৮০ শতাংশ। বিগত সময়ের মত পৃথকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ না করে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রায় ২২ হাজার পরীক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং প্রায় ৩২ হাজার জনকে সাধারণ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের শ্রমজীবী শিশুদের জন্য শহর, নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্রমজীবী মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য শিশু কল্যাণ ট্রাষ্টের মাধ্যমে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি

প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি চক্র শেষ না করেই বহু শিশু বিদ্যালয় ত্যাগ করে। কারণ, দরিদ্র পরিবারের পিতামাতাগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন অথবা পিতামাতার পেশায় সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত রাখেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ৫,৬৮৭.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২য় পর্যায় (২০০৮-১৫) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রাপ্তির আওতা ৪০ লক্ষ হতে চাহিদাভিত্তিক বৃদ্ধি করায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৮.১৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে প্রকল্পের নীতিমালার আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য মাসিক ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরকার প্রতিবছর বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে। বছরের শুরুতেই যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে সে লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। বিগত বছরে ৫০ শতাংশ নতুন এবং ৫০ শতাংশ পুরাতন বই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১০ সাল হতে সকল শ্রেণীতে শতভাগ নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ এবং ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। বইয়ের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চার রংয়ের নতুন বই সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামীতে শতভাগ নতুন বই বিতরণ অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ও সৃষ্টপদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে ৬০ শতাংশ শিক্ষিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে প্রায় ৬৪.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য প্রথম পর্যায়ে ১,৫০০ জন শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৭,৫০০ জন সহকারি শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নির্মিতব্য বিদ্যালয়ের জন্য মোট ৩,৩৩৫টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্কুল বহির্ভূত ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য কার্যক্রম

স্কুল বহির্ভূত, ঝড়ে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। **রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প** এবং **শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)** তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝড়ে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক

শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ১৪৮টি উপজেলায় ১,১৪০.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে **রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন** প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২১,৩৬১ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭.১৫ লক্ষ শিশু ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরের কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের উন্নততর জীবন অনুসন্ধানে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ এর সহায়তায় ৩০৩.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে **শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)** বাস্তবায়িত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপে মোট ৬,৬৪৬ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১.৬৬ লক্ষ শিক্ষার্থীকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়াও ১৯,১৩০জন শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

সঠিক শিক্ষা কাঠামো এবং যথাযথ শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে উপবৃত্তি প্রদান ও এককালীন বরাদ্দ প্রদান, বিনামূল্যে বই বিতরণ, স্নাতক পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ, শিক্ষার সকল স্তরে সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন (performance based continuous evaluation), শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন ও অন-লাইন কার্যক্রম গ্রহণ, উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, উচ্চ শিক্ষায় সুযোগদানের জন্য নতুন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে ১,০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান করছে। ৫,৫৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১,১৩৫টি মাদ্রাসা, ১,৫০০টি কলেজ ও ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২,৬৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯৩টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৮২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৫৫টি মাদ্রাসা এবং ৫৮১টি কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১০টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯৯টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল (সরকারি) স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। এছাড়া, এ সকল প্রকল্পের আওতায় পাঠক্রম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত Secondary Education Quality and Access Enhancement (SEQAEP) প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানকে কৃতিভিত্তিক প্রণোদনা (Performance-based incentive) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Teaching Quality Improvement (TQI) in Secondary Education প্রকল্পের আওতায় দূরবর্তী ও পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে "আইটি বেইজড মোবাইল ভ্যান" চালু করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিসহ যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম প্রণীত হচ্ছে।

কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অস্বচ্ছল পরিবারের তরুণ-তরুণীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান উপযোগী ও দেশে-বিদেশে চাকুরী বাজার চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজী কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এছাড়া, ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন স্কিলস্ সার্টিফিকেট কোর্স চালু রয়েছে। দেশে বর্তমানে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ১৯৪ টি। যে সকল জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই এমন ১০টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরে ২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার, নার্স ও বেকারদের জন্য আরবি, ইংরেজি, কোরিয়ান ও মালয় ভাষায় কথা বলার দক্ষতা প্রদানের নিমিত্ত দেশের ছয়টি বিভাগে ১১টি আধুনিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বয়ন শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব টেক্সটাইল-এ রূপান্তরের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা' ২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া, ৯৩টি সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে ৬৮,৮৪৩ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টিতে উন্নীত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নতুন নতুন একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ঢাকা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার খুলনায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে একটি মেরিন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় একটি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি, সরকার দেশে একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Higher Education Quality Enhancement (HEQEP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ সৃজনের জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করার ফলপ্রসূ

উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Accreditation Council গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং মনোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ''উচ্চশিক্ষা কমিশন'' এ রুপান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার, সংস্থাপন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ স্তরের একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত সম্পন্নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ১ম থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কোরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবী ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, এনসিটিবি' র মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থাকরণ এবং ২০১৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অভিন্ন সিলেবাসে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমে কৃষি, কম্পিউটার শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তিসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ১ম-৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৬ হাজার মাদ্রাসায় ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম

শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী আইসিটি ব্যবহারের লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রায় ১৩,৭০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫,২০০টি মাদ্রাসা ও ১,৬০০টি কলেজে একটি করে ল্যাপটপ ও একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়েছে। জ্ঞানভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয় ৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শ্রেণি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও সমমানের পরীক্ষা, শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ, এসএমএস এবং ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। ব্যানবেইস কর্তৃক স্থাপিত online data query এর মাধ্যমে Criteria ভিত্তিক শিক্ষা-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। Secondary Education Sector Development Project (SESDP) প্রকল্পের আওতায় EMIS Cell কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৮টি সফটওয়্যার মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। Teaching Quality Improvement II (TQI) in Secondary Education Project এর মাধ্যমে দূরবর্তী ও পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ৫,৪৫৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SESDP প্রকল্পের আওতায় ৩৩টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাবসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৫০০ বেসরকারি কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত ৭০ সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রেমিটেন্স আহরণে সরকারকে সহায়তা করার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশী ভাষায়

দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করাসহ ১৯টি Digital Language Laboratory স্থাপন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩,১২১টি মাদ্রাসায় (সর্বস্তরে) কম্পিউটার কোর্স চালু করা হয়ছে এবং প্রণীত কারিকুলামের মাধ্যমে কম্পিউটার শিক্ষাদান করা হচ্ছে । ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন এনসিটিবি'র ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা হয়ছে। পরর্বতীতে 'এ টু আই প্রোগ্রাম'ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহারযোগ্য পিডিএফ-এ কনভার্ট করে আপলোড করা হয়ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' এর আওতায় একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে অন-লাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়া,কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজসমূহে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি হলো মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যমান আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ কোটা হতে ২০ শতাংশ কোটায় উন্নীতকরণের জন্য প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সংস্কারমূলক কর্মসূচি

শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কৃতিভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Performance Based Continuous Evaluation), নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও অসঙ্গতি দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা আইন, ২০১৩'এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ অনুসারে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য 'বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে এবং তা বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২' এর একটি প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

অর্থ বরাদ্দ

অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি অর্থবছরে মোট ৭৫টি প্রকল্প (৫৭টি বিনিয়োগ, ১৮টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) চলমান রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাতে ৩,১০০.০০ কোটি এবং রাজস্ব খাতে ১০,০৭৯.২৩ কোটি টাকা মিলিয়ে মোট ১৩,১৭৯.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়ন কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানবকল্যাণ। সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় প্রশিক্ষিত সেবাকর্মী দ্বারা মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সেবা প্রদানের হার ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের ৩৩ শতাংশ হতে ২০১১ সাল নাগাদ ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে । একই সময়ের মধ্য প্রশিক্ষিত সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রসবের হার ১২ শতাংশ হতে বেড়ে ৩২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (BDHS-২০১১)। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা জন্ম বিরতিকরণ ব্যবহারের হার ২০০০ সালে ৫৪ শতাংশ হতে বেড়ে ২০১১ সালে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে মোট প্রজনন হার ১৯৭১-৭৫ সালে ৬.৩ হতে ২০১১ সালে ২.৩ এ নেমে এসেছে (BDHS-২০১১)। মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি সেবার ক্রম উন্নতির ফলে পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের মৃত্যু হার কমে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে প্রতি হাজার জন্মে ৯৪ জন হতে ২০১১ সালে প্রতি হাজার জন্মে ৫৩ জনে উন্নীত হয়েছে। সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের কারণে বাংলাদেশের জনগনের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ বছর হয়েছে যা ২০০৫ সালে ছিলো ৬৫ বৎসর। সম্প্রতি Maternal Mortality and Health Care Survey 2011 এর রিপোর্টে দেখা গেছে বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০১ সালে ৩.২ থেকে ২০১১ সালে ২.০৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৯১ সালে কম ওজনের প্রায় ৬৬ শতাংশ শিশু জন্ম গ্রহণ করত যা বর্তমানে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উল্লিখিত সাফল্য সত্ত্বেও অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে এবং পরিবেশ অনুকূল ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে International Conference on Population and Development (ICPD), Proverty Reduction Strategy (PRS) এবং Millenium Development Goals (MDG) এর আলোকে জাতীয় জনসংখ্যা নীতির খসড়া প্রণীত হয়েছে। এছাড়া, ইতোমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ এমডিজি গোল ৪ অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে । উল্লেখ্য,স্বাস্থ্য খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যে জাতিসংঘের নারী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সাউথ –সাউথ তথ্য প্রযুক্তি স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সারণি-১২.৩ এ ২০০৩ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য সূচকসমূহের প্রবণতা দেখানো হলোঃ

সারণি ১২.৩: স্বাস্থ্য সূচকসমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	২০.৯	২০.৮	২০.৭	২০.৬	২০.৬	২০.৫	১৯.৪	১৯.২	১৯.২
	শহর	১৭.৯	১৭.৮	১৭.৮	১৭.৫	১৭.৪	১৭.২	১৬.৮	১৭.১	২০.১
	গ্রাম	২১.৭	২১.৬	২১.৭	২১.৭	২২.১	২২.৪	২০.৪	২০.১	১৭.১
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫.৯	৫.৮	৫.৮	৫.৬	৬.২	৬.০	৫.৮	৫.৬	৫.৬
	শহর	৪.৭	৪.৪	৪.৯	৪.৪	৫.২	৫.১	৪.৭	৪.৯	৫.৯
	গ্রাম	৬.২	৬.১	৬.১	৬.০	৬.৬	৬.৫	৬.১	৫.৯	৪.৯
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৫.২	২৫.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৪	২৩.৬	২৩.৮	২৩.৯	২৩.৯
	নারী	২০.৪	১৯.০	১৮.০	১৮.১	১৮.৪	১৯.১	১৮.৫	১৮.৭	১৮.৭
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৩৫৩২	৩১৩৭	৩২৬১	৩১১০	২৯৯১	২৮৬০	২৮৩২	২৭৮৫	২৮৬০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল (বছরে)	জাতীয়	৬৪.৯	৬৫.১	৬৫.২	৬৫.৪	৬৬.৬	৬৬.৮	৬৭.২	৬৭.৭	৬৬.৮
	শহর	৬৭.৬	৬৭.৮	৬৭.৯	৬৮	৬৮.১	৬৮.৩	৬৮.৭	৬৮.৯	৬৮.৩
	গ্রাম	৬৪.৩	৬৪.৩	৬৪.৫	৬৪.৬	৬৬.০	৬৬.২	৬৬.৯	৬৭.৪	৬৬.২
শিশু মৃত্যু হার (নবজাতক, <১ বছর, প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৫৩	৫২	৫০	৪৫	৪৩	৪১	৩৯	৩৬	৪৩
	শহর	৪০	৪১	৪৪	৩৮	৪২	৪০	৩৭	৩৫	৪২
	গ্রাম	৫৭	৫৫	৫১	৪৭	৪৩	৪২	৪০	৩৭	৪৩
শিশূ মৃত্যু হার (৫ বছরের নিম্নে, প্রতি হাজারে)	জাতীয়		৮৮			৬৫				৫৩
	শহর		৯২			৬৩				৫০
	গ্রাম		৯৮			৭৭				৫৫
মাতৃ মৃত্যু হার (%)	জাতীয়	৩.৮	৩.৭	৩.৫	৩.৪	৩.৫	৩.৫	২.৫৯	১.৯৪	১.৯৪
	শহর	২.৭	২.৫	২.৭৫	১.৯৬	২.২	২.৪	১.৭৯	১.৭৮	
	গ্রাম	৪.০	৩.৯	৩.৫৮	৩.৭৫	৩.৯	৩.৯	২.৮৫	২.৩০	
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার (%)		৫৫.১	৫৬	৫৭	৫৮.৩	৫৫	৫২.৬	৫৬.১	৫৬.৭	৬১.২
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		২.৬	২.৬	২.৫	২.৪১	২.৪	২.৩	২.১৫	২.১২	২.৩

উৎসঃ BDHS Survey, 2000, 2004, 2007, 2011 স্বাপকম; SVRS, BBS; BMMS-2010স্বাপকম।

অর্থ বরাদ্দ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উন্নয়নখাতে ৩২ টি অপারেশনাল প্ল্যান সম্বলিত ১টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP) এবং ২০ টি চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প, ২ টি জেডিসিএফ প্রকল্প এবং ১ টি চলতি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ২৩ টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৩,৮১৫.৬৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১,৫২৪.২৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২,২৯১.৩৫ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (HPNSDP)

পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (এইচপিএন) খাতের বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য ও ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকা সরকারের অনুদানসসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত Health Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল-জনগণের বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তির চাহিদা বৃদ্ধি, কার্যকর সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; রোগের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা।

কমিউনিটি ক্লিনিক

একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে গ্রাম/ ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০ টি চালু হয়। কিন্তু ২০০২-০৮ মেয়াদে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে সেবা দান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরোজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে পাঁচ বৎসর মেয়াদী (২০০৯-১৪) 'Revitaliazation of Community Health Care Initiative in Bangladesh' (কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প)শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮,০০০ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার লক্ষ্যমাত্রার আওতায় মার্চ-২০১৪ পর্যন্ত ১২,৫৩৭ টি চালু করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য অত্যাবশ্যক কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানকারী হিসেবে ১৩,৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) এর মধ্যে ১৩,২৪০ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছর সময় কালে প্রায় ৭৬.৫ লক্ষ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং ১.৭ লক্ষ জন রোগীকে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে (হেলথ বুলেটিন-২০১৩)। স্বাস্থ্য খাতকে ডিজিটাল করার পদক্ষেপ হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট মডেম প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে দক্ষ মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী-র মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ ও টীকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন হলে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পাবে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, রোগ প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে। বর্তমানে দেশে Dengue, Swine Flu & SARS রোগগুলো দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। DOTS কার্যক্রমের মাধ্যমে Smear Positive ফুসফুসের যক্ষারোগ নির্ণয়ের হার প্রায় শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এ রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যের হার ৯১ শতাংশে বৃদ্ধি করে তা বজায় রাখা হচ্ছে। ফাইলেরিয়া ও ম্যালেরিয়া রোগ ২০১৫ সালের মধ্যে নির্মূল করার পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। Child Health Programme, School Health Programme, Adoloscent Health Programme , ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম ইত্যদি-র মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার অর্ন্তগত ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদেরকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তা প্রতিরোধ করে দেশকে রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ইপিআই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম, যক্ষা ও হেপাটাইটিস-বি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি দেশব্যপী টীকাদান কর্মসূচি উদযাপিত হয়েছে যার আওতায় প্রায় পাঁচ কোটি

বিশ লাখ শিশুকে (৬ মাস থেকে ১৫ বছরের নিচে) হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২ কোটি ২০ লাখের অধিক শিশুকে ভিটামিন এ খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 'ইপিআই কভারেজ' এর আওতায় বর্তমানে সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার (এক বৎসরের নিচে) ৮১ শতাংশে এবং (দুই বৎসরের নিচে) ৮৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে এক বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে বিসিজি: ৯৫ শতাংশ, ওপিভি-১: ৯৫ শতাংশ, ওপিভি-২: ৯৪ শতাংশ, ওপিভি-৩: ৯২ শতাংশ, পেন্টা-১: ৯১ শতাংশ, পেন্টা-২: ৯৩ শতাংশ, পেন্টা-৩: ৯২ শতাংশ এবং হাম: ৮৬ শতাংশ, (উৎসঃ Bangladesh EPI CES 2011)।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা

জাতীয় পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার নিমিত্ত জরুরী প্রসূতি সেবা চালু, সিএসবিএদের প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, নিরাপদ এমআর সেবা, বেসরকারি খাতের প্রসারে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম প্রবর্তন করার ফলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও অন্যান্য মাঠ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবা (Comprehensive EOC) চালু করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসমূহে এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক এ সেবা চালু রয়েছে। Obstretric Fistula সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে এবং Bangladesh National Strategy for Maternal Health চূড়ান্ত করা হয়েছে। 'মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচারস্কীম' কার্যক্রম ২০১৬ সালের মধ্যে ৫৩টি উপজেলা থেকে ১০০ টি উপজেলায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। কার্যকর প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য এ পর্যন্ত ১,৪৪১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নয়ন করা হয়েছে । এছাড়া, National Menstruation Regulation Services Guideline অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

পুষ্টি সেবা

মিলেনিয়াম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যে চ্যালেঞ্জ তার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা-১,৪ এবং ৫ প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। এ সকল চ্যা-লঞ্জ অর্জ-নর ল-ক্ষ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণাল-য়র আওতায় ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভি-সস (NNS) সারা-দ-শ বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান করছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হ'ল ; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহায়তায় অপুষ্টিজনিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সেবা প্রদান; দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা গড়ে তোলা এবং অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার কমানো। দেশের সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহে 'Severe Acute Malnutrition (SAM) ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশু অ-পুষ্টি রোধ করার জন্য ১৩০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে Integrated Management of Childhood Illness Programme (IMCI) এর সাথে সমন্বিতভাবে পুষ্টি কর্ণার চালু করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এনজিও সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে NNS শহরের বস্তি এবং গ্রামের দূর্গম এলাকাসহ সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পুষ্টি নীতি ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহে পুষ্টি কর্ণার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সকল মেডিকেল অফিসার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ৩ দিনের

পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে ওজনমাপক যন্ত্র (weighting scale) প্রদান করা হয়েছে এবং বরিশাল ও খুলনার ৯ টি দূর্গম এলাকায় 'community based nutrition (CBN)' কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বীমা

বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও জনগণের প্রত্যাশা এখনো সার্বিক অর্থে পূরণ হয়নি। স্বাস্থ্য খাতে বিকল্প অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষতা অর্জন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য বীমা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে বিনামূল্যে উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃবিভাগীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রম অন্যান্য উপজেলায়ও সম্প্রসারিত হবে।

স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি

মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফলতা আর্ন্তজাতিক অঙ্গণে ব্যপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম আই এস) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে সর্বস্তরে ই-হেলথ চালু করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় ৮০০ সরকারি হাসপাতালে SMS এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ প্রদান বা স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রি উন্নত করে নাগরিকদের স্থায়ী স্বাস্থ্য বিবরনী তৈরী করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । এর আওতায় প্রতিটি নাগরিককে একটি অভিন্ন 'Health Identifier Code' প্রদান করা হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটা বেজ এর সাথে সংযুক্ত হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ এবং ৫ অর্জন করার জন্য প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং ৫ বছরের নিচে শিশুদের তথ্য তালিকাভুক্ত করার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। জেলা হাসপাতালসমূহকে পর্যায়ক্রমে স্বয়ংক্রিয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি

১৯৬৫ সাল হতে সরকারি পর্যায়ে পরিবারকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হবার ফলে বাংলাদেশের দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার হার কম হওয়া সত্ত্বেও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অদ্যাবধি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে আধুনিক ও কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। জন্মপ্রতিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের হার ১৯৭৫ সালে ৮ শতাংশ হতে ২০১১ সালে ৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৬ সালের পূর্বে প্রতিস্থাপনযোগ্য জন উর্বরতা নিশ্চিত করা সরকারের মূল লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমানের মোট প্রজনন হার ২.৩ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ ২.০০ এ নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, যার অন্যতম হল পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ৬১ শতাংশ থেকে ২০১৬ নাগাদ ৭৪ শতাংশ এ উন্নীত করা। অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতির গ্রহীতা বাড়ানো, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেরিতে প্রথম সন্তান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় জাতীয় পর্যায়ে এমসিএইচটিআই আজিমপুর ও এমএফটিসি মোহাম্মদপুর, ঢাকা; জেলা পর্যায়ে ৬০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র; উপজেলা পর্যায়ে ৪২৭ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এমসিএইচ-এফপি ইউনিট এবং ১২ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ; ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩,৮৬০ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র এবং ২৪ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র; ১০,৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৩০,০০০ টি স্যাটেলাইট

ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, দুর্গম এলাকা, অনগ্রসর পল্লী অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কার্যকর প্রসূতি সেবা প্রদানের জন্য এ পর্যন্ত ১,৪৪১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। এ সকল মান উন্নীত কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হবে। ক্রয়/সংগ্রহ ও সরবরাহ অবস্থা ট্র্যাকিং করার জন্য Supply Chain Information Portal নামে একটি ওয়েব ভিত্তিক সফটওয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত

বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৮,৩৬৬ টি নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। এর মধ্যে ৫,৩৮৪ টি-ই ডায়াগনস্টিক সেন্টার। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু এনজিও সম্পৃক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, পিপিপি-র আওতায় দেশের দুটি সরকারি হাসপাতালে (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিস এন্ড ইউরোলজি) কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার এর সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা উৎসাহিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম চলছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অর্থ অনুদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে ৫৪টি মেডিকেল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল কলেজ, ৯ টি নার্সিং ইন্সটিটিউট, ৮টি নার্সিং কলেজ, ৮৪ টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, ৭৫ টি হেলথ টেকনোলজি ইন্সটিটিউট পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হয়েছে যা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের কারিকুলাম হালনাগাদ ও গণমুখী করা হয়েছে । দেশের সরকারি পর্যায়ে মোট ২২টি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি সংখ্যা ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ৩,৩৬৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। নার্সিং ডিপ্লোমা কোর্সের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১,৫৭০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। ৬টি নতুন মেডিকেল কলেজ (কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা ও গাজীপুর) তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ১২ টি নতুন নার্সিং ইন্সটিটিউট মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ হয়েছে এবং ৭ টি ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৭ টি নতুন হেলথ টেকনোলজি ইন্সটিটিউট এবং একটি নতুন মেডিকেল এসিস্টেন্টদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

নার্সিং সেবা

বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা এবং এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত বিভাগ হিসাবে ১৯৭৭ সালে একটি স্বতন্ত্র সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয়। দেশে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য সেবা পরিদপ্তরের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩০,৫৪৬ জন রেজিস্টার্ড নার্স আছে, তার মধ্যে ১৪,২০২ জন নার্স সরকারি চাকুরীতে, ১,০০০ জন বিদেশে এবং ১০,০০০ জন দেশের বিভিন্ন বেসরকারি

হাসপাতালে কর্মরত আছে। দেশে ৪৪ টি সরকারি (০১ টি আর্মড ফোর্সেস সহ) নার্সিং ইন্সটিটিউট এবং ৪৬ টি বেসরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউট বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশে ১০ টি সরকারি নার্সিং কলেজ (০৭ টি বেসিক এবং ০৩ টি পোষ্ট বেসিক) এবং ১৫ টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ রয়েছে। দেশে বিশেষায়িত হাসপাতালে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষ নার্স তৈরীর জন্য ৩৬১ জন নার্সকে বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশালাইজেশন কোর্সে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রটোকল অনুসারে একটি দেশের ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত হওয়া প্রয়োজন ১:৩। কিন্তু বাংলাদেশে এই অনুপাত ২:১। দেশে সরকারি নার্সিং ইন্সটিটিউটের আসন সংখ্যা ১,৫৯০ থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫৮০ করা হয়েছে এবং ২৭টি প্রতিষ্ঠানে (০৯ টি নার্সিং কলেজ এবং ১৮ টি নার্সিং ইন্সটিটিউট) ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশে অভিজ্ঞ নার্সের ঘাটতি পূরণের জন্য দেশে বেসিক বিএসসি সহ এমএসসি নার্সিং কলেজ স্থাপনের জন্য শেরেবাংলা নগরে একটি নার্সিং কলেজের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। ২০১৬ সাল নাগাদ দেশে রেজিস্টার্ড নার্সের সংখ্যা ৪০,০০০ এ উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন ও ঔষধ শিল্প

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। ঔষধ শিল্পে ব্যাবহৃত কাঁচামাল, প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানী, ঔষধ উৎপাদন, বিপণন, লাইসেন্স প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী হোমিওপ্যাথিক সহ সকল ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর কাজ। ঔষধের গুণগত মান রক্ষায় নমুনা পরীক্ষা/বিশ্লেষণের জন্য বর্তমানে ২টি সরকারি ঔষধ পরীক্ষাগার রয়েছে। ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার মহাখালিতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবেরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। এর পাশাপাশি ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাচাঁমাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ২৬৭ টি এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৩,২১৪ ব্র্যান্ডের প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জাতীয় ঔষধ নীতি-২০০৫ আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৮২ এর রিভিউ এর কাজ চলছে। প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের নিকট ক্রয়সাধ্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসমূহ সহজলভ্য করার জন্য ঔষধের তালিকা পুনঃমূল্যায়ন ও মূল্য নির্ধারণ নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে। এছাড়া, ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশি ও বিদেশি উদ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার

স্বাস্থ্য খাতকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের আওতায় বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন:

- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
- হেলথ এডভোকেসি এবং মাতৃ ভাউচার স্কিম এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সেবার আওতা ক্রমাগত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- ক্রমান্বয়ে সকল জেলা ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU সেবা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে ১৪ টি উপজেলায় ‘লোকাল লেভেল প্ল্যানিং’ এর পাইলট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- সেক্টরওয়াইড প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি সেবাকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রকে ইন্টারনেটের আওতায় এনে ই-হেলথ সেবা চালু করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্য খাতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ কে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহের নেতৃত্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- দুর্গম এলাকাসমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার লক্ষ্যে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জোরদার,পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) পূরণসহ এলাকা ও লক্ষ্যভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।
- ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যু বন্ধ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস ও নীতিসমূহের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ও জোরদার করা হচ্ছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন । এ লক্ষ্যে সম্প্রতি ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর আওতায় এদেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে গৃহীত হয়েছে জাতীয় শিশু নীতি। এছাড়া, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০।

অর্থ বরাদ্দ

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মন্ত্রণালয়ের ১৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ আছে ২৮০.৭৪ কোটি টাকা এবং মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৯.৫৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৬৪ শতাংশ।

নারী উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তিনটি সংস্থা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহিলা

বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের ৬৪ টি জেলা ও ৪১২ টি উপজেলায় এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪ টি জেলা ও ৮৪ টি উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

জেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC) **সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের মধ্যে বৃত্তিমূলক এবং অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রতা ও বেকারত্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে **শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী, জিরানী, গাজীপুর এ দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান** -শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে মহিলা ও শিশু কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপনের কাজ চলছে। উত্তর বঙ্গের তিনটি জেলার অতিদরিদ্র উপকারভোগীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে **খাদ্য ও জীবিকার নিরাপত্তা (FLS)** প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যার অধীনে এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৮০,০০০ জন অতি দরিদ্র নারী। **এ্যাডভান্সমেন্ট এন্ড প্রমোটিং উইমেন্স রাইটস** প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর আর্থিক সহায়তায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শুরু হয়ে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর নারীদের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসকরণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করা। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, বাল্য বিবাহরোধ এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা ও ঝুঁকি সমূহ হ্রাস করা এবং পারিবারিক নির্যাতনের শিকার অসহায় নারীদের আশ্রয় প্রদান, আইনগত সহায়তা, চিকিৎসা, মনো-সামাজিক পারামর্শ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পর সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করা। শহর অঞ্চলের দরিদ্র, বেকার, বিত্তহীন মহিলাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে **নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প** বাস্তবায়িত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত,শিক্ষিত-বেকার মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থান এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে **জেলাভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)** প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের কর্মকান্ডকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে টেকসই করার লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (২য় পর্যায়)** প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্বল্প মূল্যে ঘরে বসে তথ্য প্রযুক্তির সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে **তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন** শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৩টি উপজেলা তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সুবিধা সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করা ও তথ্য জগতে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে সহকারী তথ্য আপা ও জুনিয়র সহকারী তথ্য আপা নিয়োগদানের মাধ্যমে তথ্য কেন্দ্র সমূহ চালু করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি ''নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল'' আছে। নির্যাতিত মহিলাগণ এ সেলের মাধ্যমে বিনা খরচে আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকে। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১০৮ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১২০.০০ লক্ষ টাকার (এককালীন) তহবিল (আর্বতক) দ্বারা পরিচালিত স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র, বেকার ও উদ্যোগী মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন -দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা, দু:স্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল, মহিলা সহায়তা কেন্দ্র, চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্র,বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র (অঙ্গনা), নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস, ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর

(ভিজিডিইউপি), খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন (ভিজিডি), কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, সেলাই মেশিন বিতরণ ও বিধবা ভাতা কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে নারী উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

শিশু উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশু কল্যাণে শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের কোন বিকল্প নেই । তাই শিশু-কিশোর কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, শিশুর জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনাসহ শিশু নির্যাতন বন্ধ, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বৈষম্য বিলোপ সাধনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু একাডেমী ৬৪ টি জেলায় মহিলা ও শিশু উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী দেশের ৬৪টি জেলায় শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ ও আধুনিক মানব সম্পদের শক্ত ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৮,৭৩১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৫বছর বয়সী প্রায় ১১ লক্ষ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া,শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (Early Childhood Care and Development) নীতি প্রণয়ন, শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards) এর খসড়া প্রণয়নসহ বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। **সিসিমপুর আউটরীচ** শীর্ষক প্রকল্পটি ০৩-০৬ বছর বয়সী শিশুদের স্বাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা এবং মনোসামাজিক বিষয়ের ধারণার মাধ্যমে মানসম্মত শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় প্রাক শিশু বিকাশ এবং সিসিমপুর বিষয়ে সারাদেশে ৭৬ টি কর্মশালার মাধ্যমে সরকারি কমকর্তা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জন প্রতিনিধি, এনজিও, শিশু সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সচেতন করা ,বিটিভিসহ ৪টি টিভি চ্যানেল ও বাংলাদেশ বেতারসহ ৪টি রেডিও চ্যানেল এ শিশু বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে শিশুদের যত্ন নেয়ার বিষয়ে অবহিত করা, শিক্ষক ও অভিভাবকদেরকে প্রাক প্রাথমিক শিশু বিকাশ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

শিশুদেরকে প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৩০টি জেলা শাখায় ৬-১৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে ১৮ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫০ শতাংশ শিশু শ্রমিককে ট্রেডওয়ারি উপকরণ সরবরাহ করা হবে। জুলাই ২০১৪ হতে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (CLU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে CLU উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়া শিশুশ্রম নিরসনকল্পে **জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০** প্রণয়ন করা হয়েছে । ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার জন্য শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে যার মাধ্যমে আগামী তিন বছরে ৪০ হাজার শিশুকে ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে এনে তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে যাতে তারা পিতামাতাকে তাদের কাজে সহায়তা করতে পারে।

সমাজকল্যাণ

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের ওপর। বর্তমান সরকার এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্রবিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও অসহায় ছেলে-মেয়েদের লালনপালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসন, পরিত্যক্ত নবজাতক শিশুদের লালন-পালন, ভবঘুরে পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসনসহ বহুবিধ কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালনা করছে।

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম

কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা/চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, ব্রেইল প্রেস, প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র অন্যতম। গরীব ও অসহায় রোগীদের সেবা দানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৩,৮৬,০২৯ জন গরীব রোগীকে ৯১টি ইউনিটের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ২,৬৭,৮০৭ জন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ টি জেলা শহরে সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র মৈত্রী শিল্পসহ দেশের সর্বপ্রথম মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্লান্টের আওতায় উৎপাদিত 'মুক্তা' নামের মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটারের চাহিদা বাজারে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রেইল প্রেসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধনপূর্বক সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং শিশু বিধিমালা, ১৯৭৬ এর ভিত্তিতে কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। এ যাবত ৩টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৮,৩০০জন। প্রথম অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জন্য প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ২০০ জন ও ৮৯৮ জন। সমাজসেবা অধিদপ্তর

ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ ৬টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ১৯০০ জন। সমাজসেবা অধিদপ্তর শিশু-কিশোরী মহিলাদের কারাগারের পরিবেশ হতে ভিন্ন পরিবেশে রাখার জন্য দেশে ৬টি মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১১১ জন। সেফ হোম এর মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ৭,০১৩ জন।

প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রায় ১১ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর নীতিমালা, বুকলেট, ব্রসিয়ার, কার্যক্রম পরিচিতি ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

দেশে বর্তমানে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধিত এতিমখানায় প্রতিপালিত শিশুদের মধ্যে মাসিক মাথাপিছু ১,০০০ টাকা হারে ৬৬ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৫৫,০৫৬ জন এতিম শিশু উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর অধীনে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব ও ক্রীড়া

যুব উন্নয়ন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো যুবসমাজ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এ বিশাল যুবসম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮১ সাল থেকে বিভিন্ন ট্রেডে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৪১,৬৭,০১৮ জন যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের মধ্য থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ২০,০২,৪৩৬ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,২৮,৭৫৭ জন এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১,২০,৮৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ২১,৯৭২ জন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। । অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্টিলগ্ন থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৮,০৬,৬৮৭ জন উপকারভোগীকে ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ১,২২০.৭০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ''ন্যাশনাল সার্ভিস'' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ''ন্যাশনাল সার্ভিস'' কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক/যুবমহিলাদের জাতিগঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলাকে

কর্মসূচির পাইলট এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের অবশিষ্ট ৭টি জেলার মোট ৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭১,৩১৬ জন যুবক/যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ বাবদ ২৩৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিডিও সম্পাদনা কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১,১৮,০৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণের জন্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যুব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও উপজেলায় ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশিবির, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় যুব কেন্দ্র মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১৪,০৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে বগুড়ায় আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৫,৯৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১,২২০.৭০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ (ঘূর্ণায়মান ঋণের তহবিলসহ) এবং ১,০৬৯.২১ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

যে কোন দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের শারীরিক, দৈহিক এবং মানসিক উৎকর্ষ শরীর চর্চা ও খেলাধূলার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা, সুস্বাস্থ্য, নেতৃত্ব ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার অবদান অপরিসীম। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও খেলাধূলা যুগযুগ ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশ হতে আগত খেলোয়াড়দের মাধ্যমে পারস্পারিক কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে খেলাধূলার উন্নয়নে ক্রীড়া অবকাঠামো ও ক্রীড়া সুবিধাবলী অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সরকার দেশের খেলাধূলার সুবিধাদি সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার আয়োজন ও সংগঠনের বিষয়ে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক ৭৬৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ৩,৪৫৬টি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্তকরণ, প্রতিভাবান খেলোয়ারদের পরিচর্যা ও যোগ্য প্রশিক্ষক এবং ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থ বরাদ্দ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি সংস্থার ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩১৪.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত মোট ২৩৪.৬৪ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ১৯৬.৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৬৬ শতাংশ।

সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়নের গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কেননা একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি সংস্কৃতির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের কাজ করছে। বাংলা একাডেমী, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র শিক্ষা, গবেষণা,পুস্তক, জার্নাল প্রকাশসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করছে। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর শিক্ষা, গবেষণা কাজে পুস্তক, জার্নাল নথিপত্র সংরক্ষন ও প্রকাশ করছে। কপিরাইট অফিস দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাইরেসি রোধ করছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন লোকজ ও কারুশিল্প উন্নয়নের জন্য নানবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাতটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন সাইট-সমূহে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে । পাঠসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য দেশের উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে গণগ্রন্থাগার স্থাপন এবং নির্বাচিত পুস্তকসমূহ ই-বুকে রুপান্তর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের উন্নয়নের জন্য গ্যালারীসমূহের আধুনিকায়ন ও সংস্কার, বিক্রয়কেন্দ্র আধুনিকীকরণ, আহসান মঞ্জিলের আবশ্যকীয় কাজ সমাপ্ত করা হচ্ছে। শ্রীলংকার কান্ডিতে অবস্থিত দালাদা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ যাদুঘরে বাংলাদেশ কর্ণার সজ্জিত করা হচ্ছে। জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কপিরাইট ও কপিরাইট আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বরাদ্দ

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৮টি অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৪৯.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, দেশজ সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২২টি কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব বাজেট হতে মোট ২৮.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। সঠিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অগ্রগণ্য। শিল্প কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকশ্রেণী এই গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। সুতরাং দেশের সঠিক কল্যাণ তথা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের এবং শ্রমিকদের মধ্যে শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন শ্রম পরিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া, শ্রম পরিদপ্তর শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা, শ্রম বিরোধের নিষ্পত্তি, শ্রমিক শিক্ষা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে স্বল্প, মধ্যম ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত

করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিনিয়ত কাজ করে আসছে। এছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পূনঃমূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের নারী সমাজকে উৎপাদনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৬ টি বিভাগীয় সদরে ৬ টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬টি ট্রেডে দুই শিফটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রতি বছর ৪,৩২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী হাউজ কিপিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে বছরে প্রায় ২০,০০০ জন যুবমহিলা বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করছে। দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প-সম্পর্ক শিল্পায়তন-এর মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি, ২০০১ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ২২,৫৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) গঠণ করা হয়েছে। পরিষদ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অর্থ বরাদ্দ

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অর্ন্তভুক্ত মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২৭.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।